DR. DIBAKAR MANNA,
ASSISTANT PROFESSOR,
TARAKESWAR DEGREE COLLEGE

(প্রশ্ন) অন্নংভট্ট প্রদত্ত 'তর্কসংগ্রহ'-এ জ্ঞান বা বুদ্ধির লক্ষণ ব্যাখ্যা কর। লক্ষণটিকে কেন এবং কিভাবে তিনি তাঁর স্বরচিত টীকা 'দীপিকায়' পরিবর্তিত করেন? পরিবর্তনটি কি সন্তোষজনক?

অন্নংভট্ট জ্ঞান বা বুদ্ধির দুটি লক্ষণ দিয়েছেন – একটি 'তর্কসংগ্রহে' এবং অন্যটি তাঁর স্বরচিত টীকা 'দীপিকায়'।

'তর্কসংগ্রহে' অন্নংভট্ট জ্ঞানের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, জ্ঞান যার অপর নাম বুদ্ধি, বুদ্ধি যার অপর নাম জ্ঞান, তা হল আত্মার সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ইত্যাদি ২৪টি গুণের মধ্যে একটি গুণ যা আহার, বিহার, গমন, কথন, গ্রহণ বর্জন, উপেক্ষা, শব্দপ্রয়োগাদি সকল বব্যহারের হেতু। 'তর্কসংগ্রহ'র ভাষায় 'সর্বব্যবহারো হেতুর্গুণো বুদ্ধির্জ্ঞানম্'।

লক্ষণীয় যে, অন্নংভট্ট বুদ্ধি এবং জ্ঞানকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সাধারণতঃ আমরা মনে করি যে, বুদ্ধির দ্বারাই আমরা জ্ঞান লাভ করি। সুতরাং লৌকিক অর্থে বুদ্ধির দ্বারা – এরূপ বলায় বুদ্ধি হয় কারণ এবং জ্ঞান হয় তার কার্য। অর্থাৎ বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ।

সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধিকে জ্ঞানের সমার্থক হিসাবে গ্রহণ করা হয় নি। সেখানে বুদ্ধি বা মহৎ হল প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। প্রকৃতি বা জড়া বা অচেতনা হওয়ায় তার প্রথম পরিণাম বুদ্ধিও জড় বা অচেতন।

ন্যায় বৈশেষিকের অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যায়, জ্ঞান বা বুদ্ধিকে 'সকল ব্যবহারের হেতু' না বলে বলা হয়েছে – যা অর্থ বা বিষয়কে প্রকাশ করে, তাই জ্ঞান বা বুদ্ধি – 'অর্থপ্রকাশো বুদ্ধিঃ'।

কিন্তু প্রখ্যাত নৈয়ায়িক অন্নংভট্টের 'তর্কসংগ্রহে' প্রথমে দেখা গেল যে, তিনি অর্থপ্রকাশক বা বস্তু প্রকাশক যা, তাকে জ্ঞান না বলে যা 'সকল ব্যবহারের হেতু' তাকে জ্ঞান বলেছেন। তাঁর এরূপ বলার যুক্তি হল এই যে, আমরা যখনই কোন বস্তুকে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে চাই অথবা

যে কোন প্রকারের ব্যবহার চাই না কেন, সেই বস্তু সম্পর্কে আমাদের কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। কোন কিছুকে না জেনে তাকে ব্যবহার করা যায় না। তাই অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহে' জ্ঞান বা বুদ্ধির লক্ষণ দিয়েছেন - 'সর্বব্যবহারো হেতুর্গুণো বুদ্ধির্জ্ঞানম্'।

'সর্বব্যবহারহেতু' বলতে ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। শ্রীকৃষ্ণ ধূর্জটির 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়', চন্দ্রজ সিংহের 'পদকৃত্য' প্রভৃতি টীকাতে এর অর্থ করা হয়েছে - আহার, বিহার, গমন, কথন প্রভৃতি সকল রকমের ব্যবহার। কিন্তু এই প্রকার অর্থ করলে স্বপ্নচারিতা প্রভৃতি অনৈচ্ছিক ক্রিয়াসকলও বুদ্ধিপূর্বক হয়ে পড়ে।

উক্ত আপত্তি পরিহার করার জন্য গোবর্ধন মিশ্র তাঁর 'ন্যায়বোধিনী' এবং নীলকণ্ঠ তাঁর 'নীলকণ্ঠী' প্রভৃতি টীকায় 'সর্বব্যবহারে' শব্দ ব্যাবহার বা বাক্যব্যবহার সেক্ষেত্রে সর্ববহারের মানে দাঁড়ায় সকল রকমের শব্দপ্রয়োগ বা বাক্য প্রয়োগ মাত্র। সেক্ষেত্রে আহার, বিহার প্রভৃতি ব্যবহারগুলিকে বাদ দিতে হয়।

কিন্তু এইভাবে অর্থ করা হলে জ্ঞান বা বুদ্ধির লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। কারণ তখন তা নির্বিকল্পক জ্ঞান, মূক ব্যক্তির জ্ঞান বা অবোধবালকের জ্ঞানের কোনটিকেই ভাষায় প্রকাশ করা হয় না।

'তর্কসংগ্রহে' প্রদত্ত জ্ঞানের বা বুদ্ধির লক্ষণে যে 'গুণ' শব্দটি আছে, তার অর্থ সাংখ্যদর্শনে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি গুণ নয়। তার অর্থ হল আত্মা নামক দ্রব্যের একটি বিশেষ গুণ বা ধর্ম। আত্মা ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যে এই গুণটি থাকে না। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধি বা জ্ঞান আত্মার স্বরূপ নয়। বৈশেষিক মতে, বুদ্ধি বা জ্ঞান হল আত্মার আগুন্তুক গুণ। আত্মা থাকলেই গুণ থাকবে- এমন কথা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বলা হয় নি। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জ্ঞান বা বুদ্ধি নামক গুণ পদার্থটি আত্মাতে উৎপন্ন হয় এবং কালক্রমে বিনষ্ট হয়। মুক্ত অবস্থাতে আত্মাতে কোন জ্ঞানই থাকে না। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, কিন্তু তাই বলে মুক্ত আত্মা জড়ে পরিণত হয় না। জড়ের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য হল এই যে, জড় পদার্থ-একক্ষণও জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না।

দীপিকাটীকায় আন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহে' প্রদত্ত জ্ঞানের লক্ষণে কেন 'গুণ' শব্দটি, কেনই বা 'সর্বব্যবহার' ব্যবহার করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন – 'কালাদৌ অতিব্যাপ্তিবারনায় ইতি' ও 'রূপাদৌ অতিব্যাপ্তিবারনায় সর্বব্যবহারো ইতি'। অর্থাৎ কাল প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি নিবারণের

জন্য ‘গুণ’ শব্দটি এবং রূপ প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য ‘সর্বব্যবহার’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমরা জানি, সকল কার্যের হেতু হল ঈশ্বর, দিক ও কাল। এখন ‘সকল ব্যবহারের হেতু’ যা, তাকে যদি জ্ঞান বলা হত এবং ‘গুণ’ শব্দটির উল্লেখ না থাকত, তাহলে ঈশ্বর, দিক ও কাল সকল ব্যবহারের বা আওকল কার্যের হেতু হওয়ায় ঈশ্বর , দিক ও কালকেও জ্ঞান বলা হত। কিন্তু ঈশ্বর, দিক ও কাল জ্ঞান নয়। সুতরাং সকল ব্যবহারের হেতু আত্মার যে গুণ তাকে জ্ঞান বলতে হয়, ঈশ্বর, দিক ও কাল জ্ঞান নয়। সুতরাং সকল ব্যবহারের হেতু আত্মার যে গুণ তাকেই জ্ঞান বলা হয়েছে। , ঈশ্বর, দিক ও কাল আত্মার গুণ নয়। সুতরাং এগুলি জ্ঞানও নয়।

আবার, ‘সর্বব্যবহার’ শব্দটি যদি লক্ষণে না দেওয়া হত, অর্থাৎ ‘গুণোবুদ্ধির্জ্ঞানম্’– এটুকুই লক্ষণ হত, তাহলে রূপ, রস, গন্ধ, গুণ হওয়ায় ঐগুলিকেও জ্ঞান বলতে হত। কিন্তু ঐগুলি জ্ঞান নয়। কারণ তা সর্বব্যবহারের হেতু নয়। তাই ‘ন্যায়বোধিনী’, ‘নীলকণ্ঠ’ প্রভৃতি টীকায় গোবর্ধন মিশ্র ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি টীকারগণ ‘সর্বব্যবহার’ শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র শব্দ প্রয়োগরূপ ব্যাবহার বুঝেছেন। অর্থৎ আমরা যখন কোন শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করি,তখন তার হেতু বা কারণ যা, তাকেই টীকাকারগণ বুদ্ধি বা জ্ঞান বলেছেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে উক্ত তিনপ্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে লক্ষণটি প্রযোজ্য না হওয়ায় লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

এই অব্যাপ্তি দোষ থেকে লক্ষণটিকে মুক্ত করার জন্য নীলকণ্ঠ ঠিকই বলেছেন যে, ‘সর্বব্যবহারোহেতুর্গুণো’ লক্ষণের এই প্রথম অশংটি বুদ্ধির প্রকৃত লক্ষণ নয়। এটি বুদ্ধির পরিচায়ক বা স্বরূপ কথন মাত্র। বুদ্ধির প্রকৃত লক্ষণ হল শেষাংশটি। অর্থাৎ ‘বুদ্ধির্জ্ঞানম্’ অর্থাৎ বুদ্ধিই জ্ঞান। বুদ্ধি ও জ্ঞান সমার্থক। তাই বুদ্ধিকেই জ্ঞান বলা হলে জ্ঞানই জ্ঞান – এরূপ বলতে হয়।

এরূপ বলা হলে অনেকে মনে করেন যে, বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণটি সেক্ষেত্রে চক্রক দোষে দুষ্ট হয়ে পড়বে। কিন্তু বুদ্ধি বা জ্ঞান অনন্য, অদ্বিতীয় বা মৌলিক হওয়ায় সেক্ষেত্রে চক্রক দোষের উদ্ভব ঘটে না। তাছাড়া দীপিকায় অন্নংভট্ট এরূপ কথাই বলেছেন যখন তিনি বলেন–‘জানামি ইতি অনুব্যবসায়গম্য জ্ঞানত্বম্ লক্ষণম্’। অর্থাৎ জ্ঞানই জ্ঞানের লক্ষণ। জ্ঞানত্বের আশ্রয় যা, তা-ই জ্ঞান। জ্ঞাত্বের অস্তিত্বকে আমরা অনুব্যবসায়ের দ্বারা সরাসরি জানতে পারি। তাই অন্নংভট্ট দীপিকায় বলেন, ‘অনুব্যবসাগম্যজ্ঞানত্বম্’। আমি যে শুধু বস্তুকে জানি তা নয়, আমি জানি যে আমি বস্তুকে জানি। এই ‘জানার জানা’ বা জ্ঞানের জ্ঞানকে অনুব্যবসায় বলা হয়। মনোবিদ্যায় এই অনুব্যবসায়কে অন্তর্দশন বলা হয়েছে। অন্তর্দশন অনুব্যবসায় – এর দ্বারা জ্ঞান যে কি তা আমরা জানতে পারি।

আমরা আরো জানতে পারি যে, জ্ঞান সুখ নয়, দুঃখ নয়, ইচ্ছা বা দ্বেষ নয় প্রভৃতি। এইভাবে অনুব্যবসায়ে দ্বারা জ্ঞানত্বকে জেনে বুঝতে পারি যে, সেই জ্ঞানত্বের আশ্রয়ই জ্ঞান।

টীকাকার নীলকণ্ঠ ঠিকই বলেছেন যে, সর্বব্যবহার বা শব্দব্যবহারের হেতু যা তাকে জ্ঞান বলা হলে জ্ঞানের লক্ষণটি প্রকৃত লক্ষণ হয় না, কেননা, যেখানে সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি আত্মার অনন্য গুণ থেকে জ্ঞান গুণটির পার্থক্যকারী বা ব্যবর্তক ধর্মের উল্লেখ করা হয় না। প্রকৃত লক্ষণে ব্যবর্তক ধর্মের উল্লেখ থাকা চাই। তাই দীপিকায় প্রদত্ত লক্ষণটি বুদ্ধির প্রকৃওত লক্ষণ। অন্যদিকে 'তর্কসংগ্রহে' লক্ষণটি জ্ঞান বা বুদ্ধির স্বরূপ কথন মাত্র।

কোন কোন দার্শনিক, যেমন প্রাভাকর মীমাংসক, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ, অদ্বৈত বেদান্তীদের মতে, জ্ঞানকে প্রদীপের মতো বলা হয়েছে। প্রদীপ যেমন ঘট, পট প্রভৃতিকে প্রকাশ করে নিজেকেও প্রকাশিত করে, জ্ঞানও তেমনি বিষয় বা বস্তু প্রকাশক ও স্বপ্রকাশক।

অপরপক্ষে, ভাট্ট মীমাংসক ও অন্নংভট্ট প্রমুখ ন্যায়-বৈশেষিকগণের গ্রন্থে বলা হয়েছে, জ্ঞান চক্ষুর মতো। চক্ষু যেমন ঘট, পট, প্রভৃতিকে প্রকাশিত করে, কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করে না, জ্ঞানও সেইরূপ।

নৈয়ায়িকগণ আরো বলেন যে, আত্মা মন, চক্ষু, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, ঘটাদি বিষয় ও আলোক – এই পাঁচটি জ্ঞানের জন্য সমভাবে দরকার। এই পাঁচটির যেকোন একটির অভাব ঘটলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, যদিও আত্মাতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, মন বা চক্ষুতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আত্মা হল তাই জ্ঞানের সমবায়ী কারণ। আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 'যৎ সমবেতং কার্যম্ উৎপদ্যতে তৎ সমবায়িকারণম্'। মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ অর্থাৎ আত্মমনোসংযোগ জ্ঞানের অসমবায়ী কারণ এবং আলোক হল জ্ঞানের সহকারী কারণ।

-------- ------

(প্রশ্ন) 'সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতি' – স্মৃতির এরূপ লক্ষণ প্রসঙ্গে 'মাত্র' বাক্যাংশার্থ ব্যাখ্যা কর। (b) অন্নংভট্ট যথার্থ স্মৃতি অযথার্থ স্মৃতির প্রকারভেদ কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ? (c) যথার্থ স্মৃতিকে কি প্রমা বলা যায় ?

উঃ – (a) অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহে' জ্ঞান বা বদ্ধির লক্ষণ ব্যাখ্যা করার পর সেই জ্ঞান বা বুদ্ধির শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে বলেছেন – 'সা দ্বিবিধা' – 'স্মৃতিরনুভবশ্চ' অর্থাৎ সেই জ্ঞান বা বুদ্ধি দু'প্রকার যথা – স্মৃতি ও অনুভব।

অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহে' স্মৃতি লক্ষণ দিয়েছেন - 'সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতি' অর্থাৎ যে জ্ঞান কেবলমাত্র সংস্কার দ্বারা উৎপন্ন হয়, সংস্কার ছাড়া অতিরিক্ত কোঙ্কিছু দ্বারা উৎপন্ন হয় না, সেই জ্ঞানকে স্মৃতি বলা হয়।

সংস্কারের তিনটি অর্থ – বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপকতা। এই তিনটি অর্থের মধ্যে 'দীপিকায়' অন্নংভট্ট বলেছেন – 'ভাবনাখ্যঃ সংস্কারঃ' অর্থাৎ এখানে ভাবনা নামক অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। 'ভাবনা' হল প্রাক্তন বা অতীত অভিজ্ঞতার মুদ্রণ বা ছাপ।

এরপর অন্নংভট্ট তাঁর স্বরচির টীকা 'দীপিকায়' স্মৃতির লক্ষণে কেন 'জ্ঞান' শব্দটি, কেন 'সংস্কারজন্য' শব্দটি এবং কেনই বা 'মাত্র' শব্দটি সন্নিবেশিত করেছেন তা ব্যাখ্যা করেছেন।

স্মৃতির লক্ষণে যদি জ্ঞান শব্দটি সন্নিবিষ্ট না হত, 'সংস্কারমাত্রজন্যং স্মৃতি' – এরূপ লক্ষণ হত, অর্থাৎ 'যা কিছু সংস্কারের মাত্রের দ্বারা উৎপন্ন তা-ই স্মৃতি' – এরূপ বলা হত, তাহলে 'সংস্কার ধ্বংসকেও স্মৃতি বলতে হত এবং সেক্ষেত্রে স্মৃতির লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ত। যা নিয়ত পূর্বে থাকে তা কারণ। সংস্কার নিয়ত পূর্বে থাকে, তা কারণ। সংস্কার নিয়ত পূর্বে থাকলে তবেই তার ধ্বংস হওয়া সম্ভব। সংস্কার ধ্বংসের প্রতি সংস্কার নিয়ত পূর্ববর্তী হওয়ায় সংস্কারকে সংস্কার ধ্বংসের কারণ বলা হয়। এখন সংস্কারমাত্রের দ্বারা যা উৎপন্ন হয় তাকে স্মৃতি বলা হলে সংস্কার ধ্বংস এবং স্মৃতি উভয়কেই বোঝায়। কেননা, সংস্কার ধ্বংসের জন্য পূর্বে সংস্কার থাকা চাই এবং স্মৃতির জন্যও পূর্বে সংস্কার থাকা চাই। তাই সংস্কার মাত্রের দ্বারা যা উৎপন্ন হয় তাই স্মৃতি বলা হলে লক্ষণটি সংস্কার ধ্বংস এবং স্মৃতি উভয়কেই বোঝাবার জন্য লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

এই অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহারের জন্য অন্নংভট্ট স্মৃতির লক্ষণে 'জ্ঞান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সংস্কারধ্বংস সংস্কারের দ্বারা উৎপন্ন হলেও তা জ্ঞান নয়। কিন্তু স্মৃতি হল তা যা সংস্কারের দ্বারা উৎপন্ন এবং যা জ্ঞান উভয়ই। তাই অন্নংভট্ট' দীপিকায়' বলেছেন – 'সংস্কারধ্বংসে' অতিব্যাপ্তিবারণায় জ্ঞানম্ ইতি'।

যদি স্মৃতির লক্ষণে 'সংস্কারজন্যম্' শব্দটি না দেওয়া হত অর্থাৎ 'জ্ঞানম্ স্মৃতিঃ' – এইটুকুওই লক্ষণ হত, তাহলে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি স্মৃতি ভিন্ন সকল প্রকার জ্ঞানকেও বোঝাত, সেক্ষেত্রেও স্মৃতির লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হত। 'সংস্কারজন্য' শব্দটি লক্ষণে ব্যবহার করায় এই অতিব্যাপ্তি দোষ আর হয় না। তাই অন্নংভট্ট 'দীপিকায়' বলেছেন – 'ঘটাদি প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি বারণায় সংস্কারজন্যম্ ইতি'।

স্মৃতির লক্ষণে যদি 'মাত্র' শব্দটি দেওয়া না হত অর্থৎ 'সংস্কার জন্যং জ্ঞানং স্মৃতি' এরূপ লক্ষণ হত, তাহলে সেই লক্ষণের দ্বারা স্মৃতিকেও বোঝাত, তাছাড়া প্রত্যভিজ্ঞাকেও বোঝাত। প্রত্যভিজ্ঞা হল একপ্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান যেখানে স্মৃতিরও ভূমিকা থাকে, যেমন, আমি মথুরাতে এক সময় দেবদত্তকেদেখে জ্ঞান লাভ করেছিলাম 'অয়ং দেবদত্তঃ' অর্থাৎ 'এটি দেবদত্ত'। অন্য সময় বারাণসীতে দেবদত্তকে আবার দেখলাম তখন জ্ঞান হল 'সঃ অয়ং দেবদত্তঃ' – 'এই সেই দেবদত্ত' এবং এই জ্ঞানই প্রত্যভিজ্ঞা। এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞার উৎপত্তিতে বারাণসীতে দেবদত্তের সঙ্গে যেমন আমার চক্ষু সন্নিকর্ষ হওয়া দরকার, তেমনি আবার মথুরাতে দেবদত্তকে পর্বে দেখার জন্য তার সংস্কারও দরকার সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কার জন্যং এবং ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ জন্যং উভয় জন্য। অপরপক্ষে স্মৃতি কিন্তু উভয়ের জন্য নয়, কেবলমাত্র সংস্কার জন্য। প্রত্যভিজ্ঞাতে যাতে স্মৃতির লক্ষণটি প্রযোজ্য হয়ে লক্ষণটিকে অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট না করে ফেলে তাই 'মাত্র' শব্দটি লক্ষণে সন্নিবেশিত হয়েছে। দীপিকার ভাষায়, 'প্রত্যভিজ্ঞায়াম্ অতিব্যাপ্তিবারণায় মাত্র ইতি'।

তর্কসংগ্রহের অন্যতম টীকাকার নীলকণ্ঠ স্মৃতির লক্ষণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, 'তর্কসংগ্রহ'-এ অন্নংভট্টের স্মৃতির লক্ষণটি 'অসম্ভব' দোষে দুষ্ট। কারণ, কেবমাত্র সংস্কার থেকে স্মৃতি উৎপন্ন হতে পারে না। তার জন্য আত্মা, আত্মমনোসংযোগ প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে। কাজেই স্মৃতির প্রকৃত লক্ষণ হওয়া উচিৎ - 'যে জ্ঞান চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জন্য না হয়ে, আত্মার মধ্যে অতীতের নানাবিধ সংস্কার থেকে উৎপন্ন হয় তাকে স্মৃতি বলে।

গোবর্ধন মিশ্রের 'ন্যাবোধিনী' টীকাতেও স্মৃতির এই প্রকার লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং স্মৃতির উৎপত্তিতে 'সংস্কারমাত্র'-ই একপ্রকার শর্ত নয়, আত্মার উপস্থিতির এবং আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ প্রভৃতি অন্যান্য শর্তও অপরিহার্য।

(b) গ্রন্থারম্ভে স্মৃতির লক্ষণ ব্যাখ্যা করার পর অন্নংভট্ট গ্রন্থশেষে স্মৃতির শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন – 'স্মৃতিরপি দ্বিবিধা – যথার্থা অযথার্থা চেতি। প্রমাজন্যা যথার্থা। অপ্রমাজন্যা

অযথার্থা'। অর্থাৎ স্মৃতিও দুই প্রকার – যথার্থ ও অযথার্থ। প্রমা বা যথার্থ অনুভব থেকে যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তা যথার্থ। অপরপক্ষে অপ্রমা বা অযথার্থ অনুভব থেকে যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তা অযথার্থ স্মৃতি।

উল্লেখ্য যে, প্রমা কিংবা অপ্রমা কোনটিই সাক্ষাৎভাবে স্মৃতির কারণ হয় না। প্রমা থেকে প্রথমে সংস্কার জন্মে এবং সেই সংস্কারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতেই অন্নংভট্ট 'প্রমাজন্যা' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, অপ্রমার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে অপ্রমা থেকে থেকে যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেই সংস্কার পুনরুদ্রিক্ত হলে তা থেকে যে স্মৃতি জন্মায় তা অযথার্থ স্মৃতি।

(c) অন্নংভট্টের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রমা বা যথার্থ অনুভবের দ্বারা যথার্থ স্মৃতি উৎপন্ন হলেও এবং ঐ স্মৃতির বিষয়ের অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও প্রমা বলে বিবেচনা করা যায় না। প্রমার লক্ষণে 'জ্ঞান' শব্দের পরিবর্তে 'অনুভব' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় (তদ্‌বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভব যথার্থঃ) যথার্থ স্মৃতি প্রমা নয়।

ন্যায় মতে, যে জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির জনক অর্থাৎ যে জ্ঞান অনুসারে কাজ করলে সফলতা লাভ করা যায়, সেই জ্ঞানকে প্রমা বলা হয়েছে। যথার্থ স্মৃতি অনুসারে কাজ করলে সফলতা আসে। সুতরাং এই দিক থেকে চিন্তা করলে যথার্থ স্মৃতি প্রমা বলে পরিগণিত হতে পারে।

এই বিষয়ে ন্যায় দর্শনের প্রণেতা গৌতমের অনুরাগীরা বলেন যে, যদি স্মৃতি সফল প্রবৃত্তির অর্থাৎ সার্থক ক্রিয়াকলাপের জনক হয়ও, তাকে প্রমা বলা উচিৎ হবে না। প্রমার করণকে প্রমাণ বলা হয়েছে। যথার্থ স্মৃতিকে প্রমা বলা হলে সেই প্রমার করণ কি তা বলতে হবে। প্রত্যক্ষ প্রমার করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়। অনুমিতি প্রমার করণকে অনুমান প্রমাণ, উপমিতি প্রমার করণকে উপমান প্রমাণ এবং শাব্দ প্রমার করণকে শব্দ প্রমাণ বলে। ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতম এই চার প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন।

তখন যদি যথার্থ স্মৃতিকে প্রমা বলা হয়, তাহলে সেই প্রমার করণরূপে পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করতে হয়, সেক্ষেত্রে গৌতমের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই বিরোধের ভয়ে গৌতমের অনুগামী নৈয়ায়িকগণ যথার্থ স্মৃতিকে প্রমা বলে স্বীকার করেন না।

যথার্থ অনুভবের দ্বারা উৎপন্ন হলে স্মৃতি যথার্থ হয় – এরূপ বলা হলে যাচিতমণ্ডনন্যায় দোষ ঘটে। দরিদ্র বধূ সমৃদ্ধিশালীনী প্রতিবেশিনীর নিকট মণ্ডন অর্থাৎ অলংকার যাচ্ঞা করে তার দ্বারা

যেমন নিজেকে ধনী মনে করে, প্রতিবেশিনীর সমৃদ্ধির জন্যই দরিদ্র বধূর সমৃদ্ধি, তা তার নিজস্ব নয়, তেমনি যথার্থ অনুভবের প্রমাত্বের জন্যই যথার্থ স্মৃতি প্রমাত্ব হয়ে থাকে। সুতরাং যথার্থ স্মৃতিকে প্রমা বলা যায় না।

(প্রশ্ন) অন্যথাসিদ্ধ বলতে কি বোধায় ? অন্যথাসিদ্ধ কয় প্রকার ও কি কি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর ? দীপিকা অনুসরণে কারণের লক্ষণে এর ভূমিকাই বা কি তা নির্দেশ কর।

অন্নংভট্ট দীপিকায় কারণের লক্ষণের লক্ষণে বলেছেন যে, কেবলমাত্র অনন্য যা সিদ্ধ নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনাই কারণ, অন্যথাসিদ্ধ নয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা কারণ নয়। সহজ কথায়, অন্যথাসিদ্ধ বলতে বোঝায় যা অন্য শর্তের ওপর নির্ভরশীল এবং অনন্যথাসিদ্ধ বলতে বোঝায় যা অন্য শর্তের ওপর নির্ভরশীল নয়। অন্নংভট্ট 'দীপিকায়' তাকেই কারণ বলতে চেয়েছেন, যা অন্য শর্তের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজে নিজে অর্থাৎ অনন্যথাসিদ্ধ হয়ে কার্যের নিয়ত পূর্বে থেকে কার্যকে অন্নংভট্ট কি তর্কসংগ্রহে, কি দীপিকায় – কোথাও অন্যথাসিদ্ধের কোন লক্ষণই দেন নি। কেবলমাত্র 'দীপিকা'য় তিনি বলেছেন যে, 'অন্যথাসিদ্ধিঃ ত্রিবিধা' অর্থাৎ অন্যথাসিদ্ধ তিন প্রকার। সুতরাং দেখা গেল অন্নংভট্ট 'দীপিকা'য় অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ না দিয়ে তার প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন। অবশ্য তিনি প্রত্যেক প্রকার অন্যথাসিদ্ধির দৃষ্টান্তসহ লক্ষণ 'দীপিকায় দিয়েছেন, কিন্তু সাধারণভাবে অন্যথাসিদ্ধির লক্ষণ কোথাও দেন নি। অনেকে মতে তাঁর তৃতীয় প্রকার অন্যথসিদ্ধের লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, তিনি ঐ লক্ষণটিকেই সাধারণভাবে অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণরূপে নির্দেশ দিয়েছেন।

'দীপিকা'য় অন্নংভট্ট প্রথম প্রকার অন্যথাসিদ্ধের দৃষ্টান্তসহ লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন – 'যেন সহএব যস্য যং প্রতি পূর্ববৃত্তিতিত্বম্ অবগম্যতে, তৎতেন অন্যথাসিদ্ধম্। যথা তন্তুণা তন্তুরূপং তন্তুত্বং চ পটং প্রতি'। অর্থৎ যার সহিতই যে কার্যের প্রতি যার যার পূর্ববৃত্তিত্বের জ্ঞান হয়, সেই কার্যের প্রতি সেই সেই পদার্থ প্রথম প্রকার অন্যথাসিদ্ধ। যেমন, পট উৎপন্ন হতে গেলে তার কারণ হিসাবে তন্তু নিয়ত পূর্বে থাকে, আর তন্তু থাকলেই তন্তুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত তন্তুরূপ ও তন্তুত্বও নিয়ত থাকে। কিন্তু সেগুলি পটের নিয়ত পূর্ববর্তী হলেও নিজেরা তন্তুর উপর নির্ভর না করে কখনও পট উৎপন্ন করতে পারে না। তাই সেগুলিকে অন্নংভট্ট প্রথম প্রকার অন্যথাসিদ্ধ আখ্যা দেন।

অন্নংভট্ট ‘দীপিকা’য় দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এইভাবে – ‘অন্যং প্রতি পূর্ববৃত্তিত্বে জ্ঞাতে এব যস্য যং প্রতি পূর্ববৃত্তিত্বম্ অবগম্যতে ত্বং প্রতি তৎ অন্যথাসিদ্ধ। যথা শব্দং প্রতি পূর্ববৃত্তিত্বে জ্ঞাতে এব পটং প্রতি আকাশস্য’। অর্থাৎ যে কার্যের যে পদার্থে নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্ব অন্য কোন কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্বের জ্ঞানের পরেই জানা যায়, সেই পদার্থ ঐ কার্যের প্রতি দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেমন আকাশ পটের প্রতি দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ। আকাশকে শব্দের নিয়ত পূর্ববর্তী কারণ হিসাবে জানার পর আকাশকে ঘ, পট প্রভৃতি অন্য কার্যেরও নিয়ত পূর্ববর্তীরূপে জানা যায়। তাই আকাশ হল ঘট, পট প্রভৃতির প্রতি দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ।

অন্নংভট্ট তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন – ‘অন্যত্র ক্‌৯প্ত নিয়ত পূর্ববৃত্তি ন এব কার্যসম্ভাব তৎ সহভূতম্ অন্যথাসিদ্ধম্। যথা পাকজস্থলে গন্ধং প্রতি রূপপ্রাগভাবস্য’। অর্থাৎ সর্বনিম্নসংখ্যক অপরিহার্য নিয়ত পূর্ববৃত্তি পদার্থ থেকে কার্যের উৎপত্তি সম্ভব হলে, ঐ সকল পদার্থের সহভূত অর্থাৎ ঐ সকল পদার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত পদার্থগুলি তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ। যেমন, পাকজস্থলে গন্ধের উৎপত্তিতে রূপপ্রাগভাব তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ। ন্যায় মতে, কোন কার্যের উৎপত্তিতে গন্ধপ্রাগভাবকে কারণ বলতে হবে। কোন ফল্কে উত্তাপের দ্বারা তপ্ত করা হলে সেই ফলে গন্ধ, রূপ, রস প্রভৃতির উৎপত্তিতে যথাক্রমে গন্ধপ্রাগভাব, রূপপ্রাগভাব ও রসপ্রাগভাব কারণ। গন্ধের নিয়ত পূর্ববর্তীরূপে গন্ধপ্রাগভাব নিঃসন্দেহে কারণ। কিন্তু প্রশ্ন হল রূপপ্রাগভাব তো গন্ধের নিয়ত পূর্ববর্তী। সেক্ষেত্রে কি রূপপ্রাগভাবকেও গন্ধের কারণ বলতে হবে ? এতদুত্তরে বলা হয়েছে যে, যেহেতু কোন বস্তুর প্রাগভাবই সেই বস্তুর উৎপত্তির প্রতি কারণ অতএব অন্য কোন প্রাগভাবের কারণতা স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। গন্ধের প্রতি কারণরূপে যখন গন্ধ প্রাগভাব প্রসিদ্ধ তখন তার সহভূত অর্থাৎ তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত পদার্থরূপে রূপপ্রাগভাবকে কারণ বলা যায় না। গন্ধপ্রাগভাবের সহভূত হলেও রূপপ্রাগভাবকে গন্ধের কারণ বলা যায় এজন্য যে, গন্ধের উৎপত্তিতে তা অপরিহার্য নয়। রূপপ্রাগভাব তাই গন্ধের প্রতি তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ। নিয়ত পূর্ববর্তী হয়েও যদি অপরিহার্য না হয় তাহলে তাকে কারণ বলা যাবে না। অর্থাৎ কারণ হতে গেলে যেমন নিয়ত পূর্ববর্তী হতে হবে, তেমনি আবার অপরিহার্যও হতে হবে।

সুতরাং দেখা গেল যে, অন্নংভট্ট ‘দীপিকা’য় তিন প্রকার অন্যথাসিদ্ধ স্বীকার করেছেন। পটের উৎপত্তিতে তন্তুরূপ, তন্তুত্ব, তুরীত্ব, বেমাত্ব প্রভৃতি প্রথম প্রকার অন্যথাসিদ্ধ। আকাশ ও তন্তুবায় পিতাকে দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ এবং তন্তু সংগ্রহকারী ভৃত্যকে তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধবলা হয়েছে। অনুরূপভাবে ঘট কার্যের ক্ষেত্রে দণ্ডত্ব, চক্রত্ব, মৃত্তিকার রঙ প্রভৃতিকে প্রথম প্রকার

অন্যথাসিদ্ধ, আকাশ ও কুলালপিতা অর্থাৎ কম্ভকারের পিতাকে দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ এবং মৃত্তিকাবহনকারী গর্ধব প্রভৃতিকে তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ বলা হয়েছে।

ন্যায় দর্শনে একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিশ্বনাথ বিরচিত 'ভাষাপরিচ্ছেদ'। 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থে উক্ত তিন প্রকার অন্যথাসিদ্ধকে বিশ্লেষণ করে পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধতে পরিণত করা হয়েছে। 'ভাষাপরিচ্ছেদ' – এর প্রথম ও দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ হল অন্নংভট্টের প্রথম প্রকার অন্যথাসিদ্ধ, 'ভাষাপরিচ্ছেদ' – এর তৃতীয় ও চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ হল অন্নংভট্টের দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ এবং 'ভাষাপরিচ্ছেদ' – এর পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ যা, অন্নংভট্টের তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধও তাই।

(প্রশ্ন) পক্ষতা বলতে কি বোঝ ? পক্ষতার লক্ষণে সিষাধয়িষা ও সিদ্ধির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর এবং অনুমিতির লক্ষণে পক্ষতার অবদান নির্ধারণ কর।

উঃ- পক্ষতা সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের মধ্যে দু'টি মত – প্রাচীন মত ও নবীন মত।

প্রাচীন ন্যায় মতে, 'সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ' অর্থাৎ যাতে সাধ্যের সন্দেহ হয়, তাকে পক্ষ বলা হয়। পর্বতে বহ্নি আছে কিনা এরূপ সন্দেহ থাকাতেই পর্বত পক্ষ হয়। উক্ত লক্ষণ সুনিশ্চিত জ্ঞানে ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'দীপিকা'য় অন্নংভট্ট উক্ত প্রাচীন মত যে গ্রহণযোগ্য নয় তা দেখিয়েছেন। উপনিষদে বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞান হলে জীবের মুক্তি হয়। আর আত্মার জ্ঞান শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসন করলে সম্ভব হয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছ থেকে 'তত্ত্বমসি', 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম', প্রভৃতি আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন বেদবাক্য শ্রবণ করলে আত্মা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান হয়। শ্রবণের পর মনন। মনন বলতে বোঝায় 'অনুকূল যুক্তির সাহায্যে অনুমান'। এখানে প্রশ্ন হল, শ্রবণের স্তরেই ত আত্মা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান পাওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্তরে আবার মননের সাহায্যে আত্মা সম্বন্ধে অনুমান করা পক্ষতার প্রাচীন মত গ্রহণ করে সম্ভব নয়। কারণ সেই অনুমানের পক্ষ আত্মা হবে, যে আত্মা সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান আগেই হয়েছে।

আরো বলা যায় যে, 'পর্বতে বহ্নি আছে'- এরূপ সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকলেও অনুমানকারীর পর্বতে বহ্নি অনুমান করার ইচ্ছা থাকলে পর্বতে বহ্নির অনুমিতি সম্ভব। সুতরাং পক্ষ সম্বন্ধে উক্ত প্রাচীন মত যে 'সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ' তা গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্নংভট্ট তাই দীপিকা'য় নব্য ন্যায়মতে পক্ষতার লক্ষণ দিয়েছেন – 'সিষাধয়িষাবিরহসহকৃতসিদ্ধভাবঃ পক্ষতা'। 'সিষাধয়িষা'-র অর্থ হলঃ সাধন করবার অর্থৎ অনুমান করার ইচ্ছা বা অনুমিৎসা। 'বিরহ' অর্থ অভাব। 'সিদ্ধি' বলতে বোঝায় 'পক্ষে সাধ্য আছে' এরূপ নিশ্চয়তা।

সহজ কথায় বলতে গেলে লক্ষণটির শেষে 'সিদ্ধ্যভাবঃ' শব্দটি আছে তাকেই সংক্ষেপে পক্ষতা বলে। অর্থাৎ সিদ্ধির অভাবই পক্ষে সাধ্য আছে এরূপ নিশ্চয়তার অভাবই হল পক্ষতা। সিদ্ধির অভাবকে পক্ষতা বললেও অন্নংভট্ট ঐ সিদ্ধিতে একটি বিশেষণ সংযুক্ত করেছেন। বিশেষণটি হলঃ- 'সিষাধয়িষাবিরহসহকৃত'।

'পক্ষে সাধ্য আছে' – এরূপ নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার জন্য অনুমিতি আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না। তাই অন্নংভট্ট বলেছেন যে, সিষাধয়িষা বা অনুমান করবার ইচ্ছার অভাবযুক্ত সিদ্ধির অভাবই পক্ষতা।

কিন্তু সিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যের নিশ্চিত অস্তিত্বের জ্ঞান থাকলেও যদি সিষাধয়িষা বা অনুমিৎসা অর্থাৎ অনুমান করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে অনুমিতি হয় । যদি সিদ্ধ্যভাব থাকে অর্থাৎ সিদ্ধি না থাকে, তাহলে সিষাধয়িষা থাকলেও কি, না থাকলেও কি, পক্ষতা হয়। আবার যদি সিষাধয়িষা থাকে তাহলে সিদ্ধি থাকলেও পক্ষতা হয়। কিন্তু যদি সিদ্ধি থাকে, সিষাধয়িষা না থাকে অর্থাৎ সিষাধয়িষার অভাবযুক্ত সিদ্ধি থাকে, তাহলে পক্ষতা হয় না। তাই অন্নংভট্ট বলেছেন যে, সিষাধয়িষার অভাবযুক্ত সিদ্ধির অভাবই পক্ষতা।

ব্যাপারটিকে আরো স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য অন্নংভট্ট 'দীপিকা'য় দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন – প্রতিবন্ধিকা ও উত্তেজিকা। 'প্রতিবন্ধিকা' বলতে বোঝায়, যা বাধা দেয়। কোন একটি কার্য উৎপন্ন হওয়ার জন্য যা যা দরকার, সব কিছু থাকলেও কার্য হয় না, যদি প্রতিবন্ধক থাকে। কিন্তু কখনো কখনো এমনও দেখা যায় যে, ঐ প্রতিবন্ধক থাকলেও কার্য উৎপন্ন হয় যদি উত্তেজক থাকে। 'উত্তেজক' বলতে বোঝায় সেই শক্তিশালী পদার্থ যার উপস্থিতিতে প্রতিবন্ধক থাকলেও কার্য উৎপন্ন হয়।

অন্নংভট্ট সিদ্ধিকে অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয়তাকে অনুমিতির প্রতিবন্ধিকা বলেছেন। অপরপক্ষে সিষাধয়িষা বা অনুমিৎসা অর্থাৎ অনুমান করার ইচ্ছাকে উত্তেজিকা বলেছেন। প্রতিবন্ধিকা থাকলেও যদি উত্তেজিকা থাকে তাহলে যেমন কার্য উৎপন্ন হয়, তেমনি সিদ্ধি থাকলেও যদি সিষাধয়িষা থাকে তাহলে অনুমিতি হয়। ঐ সিষাধয়িষা উত্তেজিকা হয়ে সিদ্ধিরূপ প্রতিবন্ধিকার

উপস্থিতিতেও অনুমিতি সম্ভব করে। যেখানে সিদ্ধি নেই সেখানে সিষাধয়িষা থাকলেও পক্ষতা হবে, সিষাধয়িষা না থাকলেও পক্ষতা হবে। কিন্তু সিদ্ধি আছে, সিষাধয়িষা নেই অর্থাৎ সিষাধয়িষার অভাবযুক্ত সিদ্ধি আছে, সেখানে পক্ষতা হবে না। সিষাধয়িষার অভাবযুক্ত ও সিদ্ধির অভাব থাকলে তবেই পক্ষতা হয়।

অন্নংভট্ট 'দীপিকা'য় একটি উপমার দ্বারা বিষয়টি সহজবোধ্য করতে চেয়েছেন। অগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। কিন্তু চন্দ্রকান্ত মণিখচিত আংটি হাতে থাকলে অগুনে হাত দিলেও হাত পোড়ে না। চন্দ্রকান্তমণিকে প্রতিবন্ধক বলা হয়। কিন্তু প্রতিবন্ধক চন্দ্রকান্তমণি থাকলেও যদি সেখানে সূর্যকান্তমণিকে আনা হয়, তাহলে আগুনে হায় দিলে হাত পুড়ে যাবে। কেননা, সূর্যকান্তমণি উত্তেজক। সূর্যকান্তাভাববিশিষ্ট চন্দ্রকান্তাভাবই হাত পুড়ে যাওয়ার কারণ। যেখানে আগুনে হায় দেওয়া হয়েছে সেখানে যদি চন্দ্রকান্তমণি না থাকে তাহলে সূর্যকান্তমণি থাকলে কিংবা না থাকলেও হাত পুরে যাবে। সেখানে যদি সূর্যকান্তমণি ও চন্দ্রকান্তমণি দুই-ই থাকে তাহলেও হাত পুড়ে যাবে। কিন্তু যদি চন্দ্রকান্তমণি থাকে, সূর্যকান্তমণি না থাকে তাহলে হাত পুড়বে না, যেহেতু সূর্যকান্তাভাববিশিষ্ট চন্দ্রকান্তাভাব থাকছে না। অনুরূপভাবে সিষাধয়িষার অভাববিশিষ্ট প্রতিবন্ধক সিদ্ধির অভাবই অনুমিতির কারণ হয়।

স্বরচিত টীকা 'দীপিকা'য় অন্নংভট্ট এই দাবী উপস্থাপিত করেন যে, তর্কসংগ্রহে যে অনুমিতির লক্ষণ দিতে গিয়ে 'পরামর্শজন্য জ্ঞানকে' অনুমিতি বলা হয়েছে, সেই লক্ষণটি সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষের ওপরও প্রযোজ্য হওয়ায় লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষও পরামর্শ জন্য। তাই অন্নংভট্ট কেবল পরামর্শ জন্য জ্ঞানকে অনুমিতি আখ্যা 'তর্কসংগ্রহ'এ দিলেও 'দীপিকা'য় তা সংশোধন করেন এবং পক্ষতাসহকৃত পরামর্শজন্যজ্ঞানকেই অনুমিতি আখ্যা দেন। সুতরাং অনুমিতির লক্ষণে পক্ষতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

(প্রশ্ন) করণ কি ? ব্যাপারই বা কি ? করণের সঙ্গে ব্যাপার কিভাবে সংযুক্ত ? প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দের করণ ও ব্যাপার উল্লেখ কর।

উঃ- অন্নংভট্ট 'তর্কসংগ্রহ'-এ করণের লক্ষণ দিয়েছেন – 'অসাধারণং কারণং করণম্' অর্থাৎ অসাধারণ কারণকে করণ বলা হয়েছে।

উক্ত লক্ষণে কেন 'অসাধারণ' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে' তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট 'অসাধারণ' শব্দটি ব্যবহার না করে 'সাধারণ' শব্দটি যদি ব্যাবহার করা হত, তবে এই প্রকার লক্ষণ হয় 'সাধারণং কারণং করণম্' অর্থাৎ সাধারণ কারণকেই যদি করণ বলা হত, তাহলে ঈশ্বর, দিক, কাল, প্রভৃতিকেও করণ বলতে হত – এই কথা স্বরচিত 'দীপিকা' টীকায় বলেছেন। কিন্তু ঈশ্বর, তদীয় জ্ঞান, তদীয় ইচ্ছা, তদীয় প্রযত্ন, কাল, দিক, জীবের অদৃষ্ট এবং তৎ তৎ কার্যের প্রাগভাব – এই আটটি কার্য মাত্রেরই কারণ হয়। অতএব এগুলি সকল কার্যের সাধারণ কারণ। 'করণ' বলতে যাতে এগুলি না বোঝায় অর্থাৎ করণের লক্ষণটি এগুলির ওপর প্রযোজ্য হয়ে যাতে অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট না হয় সেজন্য 'অসাধারণ' শব্দটি করণের লক্ষণে ব্যবহৃত হয়েছে।

ন্যায়-বৈশেষিক কোন কার্যই একটি মাত্র কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। একটি কার্য হতে গেলে বহু কারণের সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ঐ বহু কারণকে দুভাবে ভাগ করা যায়। (১) সাধারণ এবং (২) অসাধারণ। যেকোন কার্য উৎপন্ন হতে গেলে যে কারণগুলি অবশ্য দরকার, সেই কারণগুলি সাধারণ কারণ। সাধারণ কারণগুলি ব্যাতীত অন্যান্য সকল কারণই অসাধারণ কারণ। প্রতিটি কার্যেরই সাধারণ কারণ একই বা অভিন্ন হলেও (যার সংখ্যা ৮ টি) অসাধারণ কারণগুলি কিন্তু কার্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ঘট কার্যের সাধারণ কারণ ঈশ্বর প্রভৃতি আটটি। কিন্তু অসাধারণ কারণ হল – কুম্ভকার, দণ্ড, চক্র, সলিল, মৃত্তিকা প্রভৃতি। এইভাবে পট কার্যের সাধারণ কারণ হল ঈশ্বর প্রভৃতি আটটি এবং অসাধারণ কারণ – তন্তুবায়, তন্তু, তুরি, বেমা প্রভৃতি।

অন্নভট্ট অসাধারণ কারণকে করণ বলেছেন বটে, কিন্তু কি নবীন, কি প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক গ্রন্থেই কেবলমাত্র অসাধারণ কারণকেই করণ বলা হয় নি।

নবীন মতে, 'ব্যাপারবৎ অসাধারণং কারণং করণম্' অর্থাৎ ব্যাপারযুক্ত বা ব্যাপারবিশিষ্ট অসাধারণ কারণকেই করণ বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নবীন মতে, করণের লক্ষণে 'ব্যাপারবৎ' বিশেষণটি সংযুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যাপার শব্দের অর্থ হল – তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকত্বম্'। এই লক্ষণে 'তৎ' শব্দের অর্থ কারণ। 'তজ্জন্যত্বে সতি' অর্থাৎ 'যা তৎ বা কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে' 'তজ্জন্যজনকত্বম্' অর্থাৎ 'তৎ বা করণের দ্বারা উৎপন্ন যে কার্য তার জনক অর্থাৎ কারণ' হয় তাকেই ব্যাপার বলা হয়েছে। যেমন- কপালদ্বয়ের সংযোগ' হল ঘট কার্যের ব্যাপার, কেননা তা কুম্ভকার, দণ্ড, সলিল, কপাল, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং ঐ কারণগুলির দ্বারা উৎপন্ন কার্য যে 'ঘট' তারও জনক

হয়। এইভাবে তন্তু সংযোগ হল পট কার্যের ব্যাপার, কেননা, তা তন্তুবায়, তুরি, বেমা, তন্তু প্রভৃতি কারণের দ্বারা উৎপন্ন এবং ঐ কারণগুলির দ্বারা উৎপন্ন কার্যের 'পট' তারও জনক হয়।

নবীন মতে দেখা গেল যে, কারণগুলির মধ্যে যেটি শেষ কারণ অর্থাৎ চরম বা চূড়ান্ত কারণ, যার অব্যবহিত পরেই কার্যটি সংঘটিত হয় তাকেই ব্যাপার বলে। ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য যে অসাধারণ কারণ সেগুলি হয় ব্যাপারবিশিষ্ট বা ব্যাপারযুক্ত অসাধারণ কারণ। সুতরাং নবীন মতে, এই ব্যাপারবিশিষ্ট বা ব্যাপারযুক্ত অসাধারণ কারণগুলিই করণ।

উক্ত উদাহরণ দুটিতে 'ঘট' কার্যের করণ হল – কপালদ্বয়ের সংযোগরূপ ব্যাপারটি ছাড়া অন্যান্য অসাধারণ কারণ অর্থাৎ কুম্ভকার, দণ্ড, সলিল, কপাল, মৃত্তিকা প্রভৃতি। অনুরূপভাবে 'পট' কার্যের করণ হল – তন্তুবায়, তুরি, বেমা, তন্তু প্রভৃতি অসাধারণ কারণ এবং ব্যাপার হল তন্তুসংযোগ। একদিকে অসাধারণ কারণ অর্থাৎ করণ এবং অন্যদিকে কার্য – এ দুটির মাঝে থাকে ব্যাপার। অসাধারণ কারণ অর্থাৎ করণগুলি ব্যাপারের সাথে যুক্ত হলে তবেই কার্য সংগঠিত হয়।

প্রাচীন মতে, করণের লক্ষণে বলা হয়েছে – 'ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্'। এখানে 'ফল' বলতে বোঝায় 'কার্য'। 'ফলাযোগ' অর্থাৎ 'ফলের অযোগ' বলতে 'কার্যের না হওয়াটাকে' বোঝায়। কার্যের না হওয়া 'ব্যবচ্ছিন্ন' অর্থাৎ 'নিষিদ্ধ' হয় অর্থাৎ কার্যের হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে যে কারণের দ্বারা তাই হল করণ, কেননা তা কার্যকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে অর্থাৎ শেষ কারণটি ঘটার পর কার্য ঘটার আর কোন বিলম্বই তাকে না। 'কপালদ্বয়-সংযোগের' – এর পর ঘটের উৎপত্তি হতে আর বিলম্ব হয় না বা তন্তুগুলি সংযুক্ত হয়ে যাবার পর পটের উৎপন্ন হতে আর বিলম্ব হয় না। তাই প্রাচীন মতে কপালদ্বয়-সংযোগ ও তন্তুসংযোগকে ঘট ও পটের করণ বলা হয়েছে।

উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, প্রাচীন মতে যেটি করণ, নবীন মতে এটিই ব্যাপার।

করণের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট প্রাচীন মত বা নবীন মত কোনটিই গ্রহণ করেন নি। তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দবোধের ক্ষেত্রে 'ব্যাপারবৎ অসাধারণং কারণং করণম্'-কেই অর্থাৎ নবীন মতই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যক্ষের করণ হল চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়

এবং ব্যাপার হল ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ। উপমিতির করণ হল সাদৃশ্যজ্ঞান এবং ব্যাপার হল অতিদেশবাক্যার্থস্মরণ। শব্দবোধের করণ হল পদ এবং ব্যাপার হল পদার্থস্মরণ।

অন্যদিকে দেখা যায় যে, অন্নংভট্ট অনুমিতির ক্ষেত্রে কিন্তু করণের প্রাচীন মত গ্রহণ করেছেন। তিনি পরামর্শকে অনুমিতি করণ বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্নংভট্ট অনুমিতির লক্ষণ দিয়েছেন – 'পরামর্শজন্যং জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ'। অবশ্য আমরা বলতে পারি যে, নবীন মতে অনুমিতির ব্যাপার হল পরামর্শ এবং করণ হল ব্যাপ্তি।

মনে হয় যে অন্নংভট্ট প্রয়োজন মত নবীন মত ও প্রাচীন মত – উভয় মতকেই কাজে লাগবে বলে নির্দিষ্টভাবে কোন মতকে গ্রহণ না করে – 'অসাধারণং কারণং করণম্' – করণের এই প্রকার নিজস্ব লক্ষণ দিয়েছেন।

(প্রশ্ন) অপ্রমার লক্ষণ দাও এবং তা ব্যাখ্যা কর। লক্ষণটি বিরুদ্ধে দীপিকাতে কিরূপ দোষের আশঙ্কা করা হয়েছে ? দোষটির নিরসন কিভাবে সম্ভব ? অপ্রমার বিভিন্ন প্রকারভেদ দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা কর।

অন্নংভট্টের মতে, বুদ্ধি বা জ্ঞান দ্বিবিধ স্মৃতি ও অনুভব। প্রত্যেকটি আবার যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দ্বিবিধ। যথার্থ অনুভবকে প্রমা এবং অযথার্থ অনুভবকে অপ্রমা বলে।

অন্নংভট্ট 'তর্কসংগ্রহ' – এ প্রমার লক্ষণ দিতে বলেন – 'তদ্‌বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ'। অর্থাৎ যে বস্তুটি যে প্রকার বা যাতে যে প্রকারতা ধর্ম থাকে, তাকে সেই প্রকার বা সেই প্রকারতা ধর্মযুক্ত বলে যে অনুভব, তাকে যথার্থ অনুভব বা প্রমা বলা হয়েছে।

আর, অযথার্থর অনুভব বা অপ্রমার লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট 'তর্কসংগ্রহ'– এ বলেছেন –'তদভাববতী তৎপ্রকারকঃ অযথার্থঃ' অর্থাৎ যে বস্তুটি যে প্রকার নয় বা যে বস্তুতে যে প্রকারতা ধর্মটির অভাব থাকে, সেই বস্তুটিকে সেই বস্তুটিকে সেই প্রকারক বা সেই বস্তুটিতে সেই প্রকারতা ধর্মটি আছে এই প্রকার যেঁ অনুভব, তাকে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা বলা হয়েছে।

যথা + অর্থ = যথার্থ এবং অযথা + অর্থ = অযথার্থ। যে বস্তুটি যথা অর্থাৎ যে প্রকার, তাকে তথা বা সেই প্রকারই বলে যদি অনুভব করা হয়, তাহলে তা যথার্থ অনুভব বা প্রমা। অপরপক্ষে

যে বস্তুটি যথা বা যে প্রকার নয়, তাকে সেই প্রকার বা তথা বলে যে অনুভব, তা অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা।

যথার্থ অনুভবের লক্ষণের প্রথমাংশে 'তদ্বতি'-তে যে 'তৎ' আছে অযথার্থ অনুভবের লক্ষণের প্রথমাংশে 'তদভাববতি'-তে যে 'তৎ' আছে, সেই 'তৎ' বলতে বোঝায় 'সেই'। এই 'সেই' বা 'তৎ' হল বিশেষণ বা গুণ বা প্রকার। 'তদভাববতি তৎপ্রকারক' বলতে বোঝায় যেখানে যে প্রকারতা যুক্ত গুণ বা ধর্মটি থাকে না, সেখানে যদি তৎপ্রকারক অর্থাৎ সেই প্রকারতা ধর্ম বা গুণ বিশেষণটি আছে বলে মনে হয়, তাহলে তা অযথার্থর অনুভব বা অপ্রমা হবে।

ঈষৎ অন্ধকারাবৃতস্থানে পতিত রজ্জুর সঙ্গে চক্ষুর সন্নিকর্ষ হলে 'অয়ং সর্পঃ' - এরূপ অনুভব হয়। অনুভবই অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। কারণ এই অনুভব সর্পত্ব ধর্মটি প্রকার বা প্রকারতাবিশিষ্ট ধর্ম। 'তৎ' শব্দের দ্বারা এই প্রকার বা প্রকারতাবিশিষ্ট ধর্মকেই বোঝায়। 'তদভাববতি' বলতে বোঝায় সর্পত্বের অভাব যে স্থানে আছে সেই রজ্জুতে। 'তৎপ্রকারক' অর্থাৎ সর্পত্ব প্রকারক অনুভব হওয়ায় তা অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা হবে।

অনুরূপভাবে শুক্তিতে রজতত্বের অভাব আছে। কিন্তু সেই শুক্তিতে যদি 'ইদং রজতম্' বা 'ইহা রজত' এই প্রকার জ্ঞান হয় অর্থাৎ শুক্তিকে যদি রজতত্ববিশিষ্ট জানা হয় তবে তা অযথার্থ অনুভব হবে।

সুতরাং 'তৎ' শব্দের অর্থ প্রকারতাবিশিষ্ট ধর্ম, এখানে সর্পত্ব বা রজতত্বকে বোঝায়। 'তদভাব' অর্থ সেই ধর্মের অভাব, অর্থাৎসর্পত্বের অভাব বা রজতত্বের অভাব। 'তদভাববৎ' – এর অর্থ সর্পত্ব বা রজতত্বের অভাব আছে যাতে অর্থাৎ এখানে রজ্জুতে বা শুক্তিতে। এখন যদি এরূপ সর্পত্বের অভাবযুক্ত রজ্জুতে বা এরূপ রজতত্বের অভাবযুক্ত শুক্তিতে 'তৎপ্রকারকের অনুভব' অর্থাৎ সর্পত্বের বা রজতত্বের অনুভব হয় তাহলে তা অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা হবে।

(খ) অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমার উক্ত লক্ষণের বিরুদ্ধে অন্নংভট্ট 'দীপিকা'তে একটি আপত্তি উত্থাপন করে তার খণ্ডনও করেছেন। তিনি বলেছেনযে, লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা করা যায়, কেননা 'ইদং সংযোগি' বা 'ইহা সংযোগগুণযুক্ত' – এই প্রমা বা যথার্থ অনুভবের ক্ষেত্রেও অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমার লক্ষণটি প্রযোগ করা যায়। বৃক্ষে বানর সংযোগ গুণটি আছে বা হস্তে

লেখণীসংযোগ গুণটি আছে – এই উভয় যথার্থ অনুভব বা প্রমার ক্ষেত্রে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমার উক্ত লক্ষণটি প্রযোজ্য হয়ে অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা থেকে যায়।

বৃক্ষের একটি শাখা একটি বানর বসে আছে। বৃক্ষ ও বানর উভয়ই দ্রব্য পদার্থ হওয়ায় দুটি দ্রব্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা সংযোগ সম্বন্ধ, সমবায় সম্বন্ধ নয়; কেননা সমবায় সম্বন্ধ দুটি দ্রব্যের মধ্যে থাকে না, থাকে দ্রব্য একদিকে এবং গুণ বা ধর্ম প্রভৃতি অন্যদিকে।

আবার হস্তে যখন লেখণী গ্রহণ করা হয় তখন হস্তে লেখণী সংযোগ ঘটে। সংযোগ নামক গুণটি যে স্থানে থাকে বা যে দ্রব্যে থাকে সেই দ্রব্যে তার অভাবও থাকে। লেখণীর সঙ্গে হস্তের সংযোগ হস্তে আছে। ঐ হস্তে সংযোগের অভাবও আছে। কেননা, হস্তের তিনটি অঙ্গুলিতে- মধ্যমা, তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে লেখণীর সঙ্গে সংযোগ আছে। কিন্তু কনিষ্ঠা ও অনামিকার সঙ্গে সংযোগের অভাবও আছে। সুতরাং হস্তকে একদিকে যেমন লেখণীসংযোগবান বলা যায়, অন্যদিকে তেমনই আবার তাকে লেখণীসংযোগাভাববান্‌ও বলা যায়। এই দুই প্রকার অনুভব হলে উভয়ই যথার্থ অনুভব বা প্রমাই হয়।

কিন্তু অযথার্থ অনুভবের যে লক্ষণটি করা হয়েছে, সেই লক্ষণটিও উক্ত যথার্থ অনুভবের ওপরও প্রযোজ্য হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু 'হস্ত লেখণীসংযোগবান' – এই যথার্থ অনুভবটি 'তদভাববতি তৎপ্রকারকঃ' অর্থাৎ যাতে যে ধর্মের অভাব আছে তাতে তাই আছে বলে অনুভব হয়েছে। এখানে লেখণীসংযোগ হল প্রকারক ধর্ম বা গুণ। হস্ত ঐ প্রকার গুণের অভাবযুক্ত। লেখণীসংযোগের অভাব যে হস্তে আছে সেই হস্তকেই লেখণীসংযোগ গুণযুক্ত বলে অনুভব হয়েছে। সুতরাং 'হস্তঃ লেখণীসংযোগবান্' এই অনুভবটির লক্ষণ প্রযোজ্য হয়ে যায়।

অন্নংভট্ট 'দীপিকা'-য় – 'ননু ইদং সংযোগি ইতি প্রমায়াম্ অতিব্যাপ্তিঃ' বলে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যেখানে 'ইদং সংযোগি' বলতে তিনি বৃক্ষ কপিসংযোগি বা হস্ত লেখনী সংযোগি এরূপ বোঝাতে চেয়েছেন। বৃক্ষে যখন বানর উপবিষ্ট থাকে তখন বৃক্ষের সঙ্গে কপি বা বানরের সংযোগ ঘটে যেমন বলা যায়, তেমনি আবার বৃক্ষকে কপি সংযোগাভাববানও বলা যায়। কেননা, বৃক্ষের একটি শাখার সঙ্গে কপির সংযোগ ঘটে। কিন্তু বৃক্ষের অন্যত্র কপিসংযোগের অভাব থাকে। সুতরাং লেখণীসংযোগযুক্ত হস্তকে যেমন লেখণীসংযোগাভাববান বলা যায়, তেমনি আবার হস্তকে লেখণীসংযোগযুক্ত এবং লেখণীসংযোগাভাববান – উভয়ই বালা যায়। তাই বৃক্ষ ও হস্ত – উভয় ক্ষেত্রেইও অপ্রমা লক্ষণটি প্রমার ওপরও প্রযোজ্য হয়ে যায় বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

(গ) কিন্তু আশঙ্কাটির নিরসনে অন্নভট্ট 'দীপিকা'য় বলেছেন – যদবচ্ছেদেন যৎসম্বন্ধাভাবঃ তদবচ্ছেদেন তৎসম্বন্ধ জ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ'।

অর্থৎ যে অংশে যার সম্বন্ধের অভাব থাকে, সেই অংশে তার সম্বন্ধের জ্ঞানই অযথার্থ অনুভব বলে বুঝতে হবে। হস্তের যে অংশে লেখনী সংযোগের অভাব আছে, সেই অংশেই যদি লেখনীসংযোগের জ্ঞান হত অথবা বৃক্ষের যে অংশে কপি সংযোগের অভাব আছে সেই অংশেই যদি কপি সংযোগের জ্ঞান হত তাহলে তা অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা হত। সংযোগের অভাব যে অংশে আছে, সেই অংশে সংযোগের জ্ঞান না হওয়ায় ঐ জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা হবে না। কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলিতে লেখনী সংযোগ নেই, তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠাতে লেখনী সংযোগ আছে। যদি কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলিতে লেখনী সংযোগরূপ গুণের জ্ঞান হয়, তাহলে তা হবে অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা। এইভাবে যদি তর্জনী প্রভৃতিতে লেখনীসংযোগাভাবের জ্ঞান হয়, তাহলে তাও হবে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। অনুরূপভাবে যদি বৃক্ষের শাখাতে কপিসংযোগাভাবের জ্ঞান হয়, তাহলে তা হবে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। আবার যদি বৃক্ষের মূলে কপি সংযোগ গুণটির জ্ঞান হয়, তবে তাও হবে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। এইভাবে অন্নংভট্ট 'দীপিকা'য় অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমার বিরুদ্ধে আশঙ্কিত সম্ভাব্য অতিব্যাপ্তি দোষের অভিযোগটির নিরসন করেছেন।

(ঘ) অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থের প্রথম দিকে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমার লক্ষণ ব্যাখ্যা করার পর গ্রন্থের শেষের দিকে তার বিভিন্ন প্রকারভেদ দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করেছেন।

অন্নংভট্টের মতে, অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা তিন প্রকার – সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক। সংশয়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ'-এ বলেছেন – 'একস্মিন্ ধর্মিণি বিরুদ্ধ নানা ধর্মবৈশিষ্ট্য জ্ঞানং সংশয়ঃ'। অর্থাৎ একই ধর্মী বা বস্তুতে বিরুদ্ধ একাধিক ধর্মের অর্থাৎ গুণের একই সময়ে একত্র অবস্থানের যে জ্ঞান তাই সংশয়।

'ধর্মী' বলতে বোঝায় – যাতে ধর্ম বা গুণ আছে তা 'ধর্মিণি' বলতে বোঝায় যে বস্তুতে গুণ বা ধর্ম আছে সেই বস্তুতে। 'বিরুদ্ধ নানা ধর্ম' বলতে বোঝায়- একাধিক বিরুদ্ধ বিপকল্প। একাধিক গুণ বা বিকল্প যখন একই সময়ে একই বস্তুতে থাকতে পারে না, তখন সেই বিকল্প ধর্ম বা গুণগুলিকে পরস্পর বিরুদ্ধ বলা হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভ্রমণরত কোন ব্যক্তির সম্মুখে বা অদূরে ভূমির ওপর দণ্ডায়মান দেখলে বস্তুটিকে স্থানু অর্থাৎ বৃক্ষের শাখাপত্রহীন কাণ্ড বা পুরুষ অর্থাৎ মানুষ বলে মনে হতে পারে। এইভাবে অদূরবর্তী বস্তুটির ওপর স্থানুত্ব অর্থাৎ জড়ত্ব এবং পুরুষত্ব

অর্থাৎ চেতনা – এই দুটি বিরুদ্ধ গুণের আরোপ করে যখন বলা হয় 'স্থানুর্বা পুরুষো বেতি'। অর্থাৎ বস্তুটি স্থানু (গাছের গুঁড়ি) বা পুরুষ (মানুষ) তখন একই বস্তুতে এই প্রকার বিরুদ্ধ নানা গুণ থাকার যে জ্ঞান হয় তা সংশয়।

সংশয়ের উক্ত লক্ষণে কেন 'এক', কেন 'বিরুদ্ধ' এবং কেনই বা 'নানা' শব্দ তিনটি ব্যবহার করা হয়েছে তা অন্নংভট্ট তাঁর স্বরচিত টীকা 'দীপিকা'য় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন – লক্ষণে যদি 'এক' শব্দটি ব্যাবহার না করা হত, শুধুই যদি বলা হত বিরুদ্ধ নানা ধর্মের জ্ঞানই সংশয় তাহলে 'ঘটপটৌ' অর্থাৎ 'ঘট' ও 'পট' এরূপ জ্ঞানকেও সংশয় বলতে হত। ঘটে ঘটত্ব ও পটে পটত্ব আছে। ঘটত্ব ও পটত্ব দুটি বিরুদ্ধ গুণ, কেননা ঘটত্ব পটত্ব নয় ও পটত্ব ঘটত্ব নয়। 'ঘটপটৌ' অর্থাৎ ঘট আছে এবং পটও আছে – এরূপ জ্ঞানকে সমূহালম্বন বা সমষ্টি জ্ঞান বলা হয়। সংশয় লক্ষণে যদি 'এক' শব্দটি ব্যবহার না করা হয় তাহলে 'ঘটপটৌ' এরূপ সমূহালম্বন বা সমষ্টি জ্ঞানকেও সংশয় বলা হত এবং এক্ষেত্রে সংশয়ের লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ত। তাই সংশয়ের লক্ষণে 'একস্মিন্' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সংশয়ের লক্ষণে 'বিরুদ্ধ' শব্দটি ব্যবহার না করা হত অর্থাৎ একই ধর্মী বা দ্রব্যে নানা ধর্ম বা গুণ থাকার জ্ঞানকেই যদি সংশয় বলা হত, তাহলে 'ঘটো দ্রব্যম্' অর্থাৎ 'ঘট দ্রব্য' এরূপ জ্ঞানকে সংশয় বলতে হয়, কেননা একই বস্তুতে ঘটত্ব ও দ্রব্যত্ব এই দুটি গুণের অবস্থানের জ্ঞান হত। কিন্তু একই বস্তুতে দুটি গুণের অস্তিত্ব থাকার জ্ঞানকে সংশয় বলা হয় নি। সংশয় হতে গেলে সেই দুটি গুণকে পরস্পর বিরুদ্ধ হতে হবে। ঘটত্ব ও দ্রব্যত্ব ভিন্ন হলেও বিরুদ্ধ নয়, যেহেতু ঘটে ঘটত্ব ও দ্রব্যত্ব – উভয়েরই সহাবস্থান সম্ভব।

আবার সংশয়ের লক্ষণে 'নানা' শব্দটি ব্যবহার না করা হত তাহলে "বস্তুটি পটত্ব বিরুদ্ধ ঘটত্ববান" এরূপ জ্ঞানকেও সংশয় বলতে হত। কিন্তু এরূপ জ্ঞান সংশয় নয়। কারণ এখানে বস্তুটিতে একটিমাত্র গুণ আছে, সেটি ঘটত্ব, যে ঘটত্ব গুণটি পটত্বের বিরুদ্ধ গুণ। সুতরাং বস্তুটিতে একটিমাত্র গুণ (ঘটত্ব) থাকায়, নানা গুণ না থাকায় সংশয় হয় না।

সংশয়কে এক প্রকার অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা বলার কারণ এই যে, দূরবর্তী বস্তুতে স্থানুত্ব ও পুরুষত্ব গুণ দুটির অভাব থাকা সত্বেও বস্তুটিকে হয় স্থানু অথবা পুরুষ এরূপ বলায় জ্ঞানটি তদভাববতি তৎপ্রকারক হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় প্রকার অপ্রমাকে 'বিপর্যয়' বলা হয়েছে। মিথ্যা জ্ঞানই বিপর্যয়। যেমন, শুক্তিতে 'এটি রজত' বা রজ্জুতে 'এটি সর্প' এই প্রকার জ্ঞানই বিপর্যয়।

উল্লেখ্য যে, সংশয় অ-নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। কিন্তু বিপর্যয় নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। কোন ধর্মীতে বা বস্তুতে যে ধর্ম বা গুণের অভাব আছে সেই বস্তুতে সেই ধর্ম বা গুণের জ্ঞান হওয়াকে বিপর্যয় বলে।

তৃতীয় প্রকার অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমাকে তর্ক বলে। অন্নংভট্ট 'তর্কসংগ্রহ'-এ তর্কের লক্ষণ দিয়েছেন – ব্যাপ্যারোপেন ব্যাপকারোপঃ তর্কঃ'। ব্যাপ্যের আরোপের দ্বারা ব্যাপকের আরোপকে তর্ক বলে। অন্নংভট্ট তাই তর্কের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন – 'যদি বহ্নিঃ ন স্যাৎ, তর্হি ধূমঃ অপি নঃ স্যাৎ'। অর্থাৎ যদি বহ্নি না থাকে তাহলে ধূমও থাকে না। এই উদাহরণে বহ্নির অভাব ব্যাপ্য এবং 'ধূমাভাব' ব্যাপক। তর্কের লক্ষণের অন্তর্গত 'আরোপ' শব্দটির দ্বারা আহার্য জ্ঞান বুঝতে হবে। বাধকালীনি ইচ্ছাজন্য জ্ঞানকে আহার্য জ্ঞান বলে। সুতরাং তর্কের সমগ্র লক্ষণটির অর্থ দাঁড়ায় এরূপ – ব্যাপ্য বিষয়ক আহার্য জ্ঞানকেই তর্ক বলে।

তর্ক এক প্রকার অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা হলেও তর্ককে অনুমান নামক প্রমাণের শায়ক বা সাহায্যকারী বলা হয়েছে। 'দীপিকা'র ভাষায় – যদ্যপি তর্কঃ বিপর্যয়ে অন্তর্ভবতি তথাপি প্রমাণু-গ্রাহকত্বাৎ ভেদেন কীর্তনম্'। অর্থাৎ যদিও তর্ক এক প্রকার অযথার্থ অনুভব বা ভ্রান্ত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত তথাপি তর্ক অনুমান নামক প্রমাণের অনুগ্রাহক বা সাহায্যকারী হওয়ায় পৃথকভাবে অন্নংভট্ট তর্কের আলোচনা করেছেন।

ব্যাপ্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় – এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি 'যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি' – এই প্রকার ব্যাপ্তি বলে স্বীকার করতে না চায়, তাহিলে তখন তার কাছে তর্কের অবতারণা করতে হয়, বলতে হয় যে, ধূম মাত্রই বহ্নির দ্বারা উৎপন্ন। যদি বহ্নি না থাকে তাহলে বহ্নি থাকতে পারে না। অর্থাৎ বহ্নিমান বস্তু মাত্রই বহ্নিমান – একথা অস্বীকার করলে কার্য-কারণ সম্পর্ককে অস্বীকার করতে হয়, যা সর্বজন স্বীকৃত।

ব্যাপ্তিবচন প্রতিষ্ঠায় তর্কের একপ্রকার ভূমিকা থাকায় অন্নংভট্ট তর্ক একপ্রকার অযথার্থ জ্ঞান হওয়া সত্বেও তাকে অনুমান নামক যথার্থ অনুভব বা প্রমার অনুগ্রাহক বা সাহায়ক আখ্যা দিয়েছেন।